

মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদের
ইসলাম গ্রহণের রোমাঞ্চকর কাহিনি

দুর্গম পথের যাত্রা



আসাদ বিন হাফিজ

ঐতিহাসিক উপন্যাস

দুর্গম পথের যাত্রী

(মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের রোমাঞ্চকর কাহিনি)

আসাদ বিন হাফিজ



গার্ডিয়ান

পা ব লি কেশ ন স

ঐতিহাসিক উপন্যাস

দুর্গম পথের যাত্রী

(মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের রোমাঞ্চকর কাহিনি)

আসাদ বিন হাফিজ

প্রকাশনায়

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮

guardianpubs@gmail.com

www.guardianpubs.com

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com

প্রথম প্রকাশ : ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

শব্দ বিন্যাস : গার্ডিয়ান টিম

প্রচ্ছদ : নাসিমা তামান্না

মুদ্রণ : একতা অফসেট প্রেস

১১৯, ফকিরাপুল, জবেদা ম্যানশন, মতিঝিল, ঢাকা।

হার্ডকভার মূল্য : ২৭০পেপারব্যাক মূল্য : ২৫০

ISBN- 978-984-8254-69-1

Durgom Pother Jatri, Asad Bin Hafiz Published by
Guardian Publications, Price TK. 270 (HC)/TK. 250 (PB) Only.

১

আরবের উষর মরুভূমি। নিঃসঙ্গ পথ চলছে এক পথিক। সময়টা ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ, অষ্টম হিজরি। সে সময় আরবের এই মরু অঞ্চল— যেখানে মক্কা ও মদিনা অবস্থিত, সেখানে ভীষণ ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছিল। খইফোটা উত্তপ্ত বালুকা প্রান্তরের বিপুল বিস্তার চারদিকে। প্রচণ্ড দাবদাহের ঝলসানো উত্তাপে পথ চলা দায়। একে তো নিদারুণ প্রকৃতি, তার ওপর ডাকাত ও লুটেরাদের ভয়। পথিকেরা পথ চলে দল বেঁধে, কাফেলার সাথে একাত্ম হয়ে। কিন্তু এই পথিক পথ চলছেন একাকী। ঘোড়াটি তাঁর বেশ উন্নত জাতের। পরনে যুদ্ধের পোশাক। কটিবন্ধে তলোয়ার। হাতে বল্লম। চেহারা নির্বিকার।

পথিকের বুক প্রশস্ত। একহারা লম্বা দেহ। সুঠাম শরীর। চেহারা আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। তিনি যে ভঙ্গিতে অশ্বপৃষ্ঠে বসে আছেন, তা দেখলে যে কেউ ভাববে, তিনি একজন রাজকুমার; কোনো সাধারণ মানুষ নন।

তাঁর চোখে-মুখে ভয়, সংকোচের সামান্যতম লেশমাত্র নেই। পথে ডাকাতের দল এসে লুটে নেবে তাঁর উন্নত জাতের ঘোড়া, বিপন্ন অবস্থায় তাকে পাঁয়ে হেঁটে চলতে হবে— এমন কোনো সম্ভাবনার কথা তিনি আদৌ ভাবছেন না। তাঁর চেহারা কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছেন তিনি। মনের পর্দায় ভেসে উঠছে তাঁর অনেক স্মরণীয় ঘটনা, জীবনের অনেক তিক্ত-মধুর স্মৃতি। কোনোটা মনে উদয় হয়েই হারিয়ে যাচ্ছিল, কোনোটা আবার হৃদয়ের গভীরে গোঁথে যাচ্ছিল আরও গভীরভাবে।

সামনে দুটো উঁচু পাহাড়। মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ গিরিপথ। ছন্দময় তালে নির্বিঘ্নে ছুটে চলেছে ঘোড়া। একসময় আরোহীকে নিয়ে প্রবেশ করল গিরিপথে। গিরিপথ ক্রমান্বয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে। সে পথ ধরে এগিয়ে চলল ঘোড়াটি। একসময় উঠে এলো পাহাড়ের চূড়ায়। চূড়ার সমতল জায়গাটিতে পৌঁছে আরোহী ঘোড়া থামালেন। পাঁদানিতে দাঁড়িয়ে ঘুরে পেছন ফিরে দেখলেন। না, এখন আর মক্কা দেখা যাচ্ছে না। দিগন্তের অন্তরালে হারিয়ে গেছে।

কে যেন তাঁর ভেতর থেকে কথা বলে উঠল— ‘আবু সোলায়মান! আর পেছন ফিরে তাকিয়ো না, মক্কার কথা মন থেকে মুছে ফেলো। তুমি এখন সীমাহীন দিগন্তের এক নিরলস যাত্রী! মক্কার কথা স্মরণ করে নিজের সত্তাকে দুভাগে ভাগ করো না। আবেগকে সংহত করো। সংযত করো চিত্তকে। মনকে দৃঢ় করে নিজের সিদ্ধান্তে অটল হও। মক্কা নয়; তোমার গন্তব্য এখন মদিনা।’ তিনি মক্কার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। লাগাম টেনে ঘোড়াকে ইঙ্গিত করলেন সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। ঘোড়া আরোহীর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে পা বাড়াল। পূর্ণ গতিতে ছুটে চলল মদিনার দিকে।

আরোহীর বয়স ৪৩, কিন্তু বয়সের তুলনায় তাকে যুবক বলেই মনে হয়। সোলায়মান তাঁর ছেলের নাম। পিতার নাম ওয়ালিদ। আরবের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তাঁর নাম হওয়ার কথা খালিদ বিন ওয়ালিদ। কিন্তু এ মুহূর্তে নিজেকে আবু সোলায়মান ভাবতেই তাঁর ভালো লাগছে। নিঃসঙ্গ মরু প্রান্তরে ধুলোর ঝড় তুলে ছুটে চলেছে রাজকীয় আরোহী। তাঁর জানা নেই, একদিন তাঁর এ ছুটে চলা হবে ইতিহাস। হাজার বছর পরও মানুষ গর্বভরে স্মরণ করবে তাঁর কথা। তবে আবু সোলায়মান নামে নয়; স্মরণ করবে খালিদ বিন ওয়ালিদ নামে। প্রতিটি জিহাদের ময়দানে মুজাহিদের অন্তরে খোদাই করা থাকবে এ নাম। যেখানেই সত্য আর মিথ্যার সংঘাত বাধবে, সেখানেই এ নাম সাহস ও প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে সত্যের সংগ্রামীদের। কিন্তু ৪৩ বছর বয়সে যখন তিনি মদিনায় যাচ্ছিলেন, তখনও মুসলমানের কাতারে শামিল হননি তিনি। বরং এতদিন ইসলাম ও কুফরের মধ্যে যেসব ছোটো ছোটো খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে, সেসব যুদ্ধে; এমনকী বদর ও উহুদের প্রান্তরে মুসলমানদের সাথে কাফিরদের যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়, তাতেও তিনি কাফিরদের পক্ষেই অস্ত্র ধরেছিলেন।

৬১০ খ্রিষ্টাব্দের পবিত্র এক সোমবার। মহানবির ওপর নাজিল হয় আল্লাহর প্রথম ওহি। খালিদের বয়স তখন ২৪ বছর। তিনি তখন তাঁর সম্প্রদায় বনু মাখজুমের ফৌজি সালার। বনু মাখজুম কুরাইশ সম্প্রদায়েরই একটি সম্মানিত শাখা। কুরাইশ গোত্রের নিরাপত্তা ও সামরিক কর্তৃত্ব এই বংশের ওপর ন্যস্ত। কুরাইশ গোত্রের সকলেই খালিদের পিতা ওয়ালিদের কর্তৃত্ব মেনে চলত। তাঁর আদেশ ও মীমাংসা মেনে নিত সত্ত্বষ্টচিত্তে। ২৪ বছর বয়সেই খালিদের ওপর এই সম্মানজনক দায়িত্ব অর্পিত হয়। দীর্ঘ উনিশ বছর তিনি এই সামরিক দায়িত্ব পালন করেন সাফল্যের সাথে, কিন্তু তারপর? তারপর একদিন সেই দায়িত্ব পরিত্যাগ করে আবু সোলায়মান মক্কা ছেড়ে মদিনার পথ ধরেন।

আবু সোলায়মান আপন মনে পথ চলেছেন, গন্তব্য মদিনা। কৈশোর ও যৌবনের হাজারো স্মৃতি তাকে পিছু টানছে। এ স্মৃতির টানে বারবার তিনি পিছু ফিরে তাকাতেন। কিন্তু তাঁর সংকল্প এসে তাকে আহ্বান জানাত— খালিদ, আর পিছু ফেরা নয়, তোমার সামনে এখন অপেক্ষা করছে এক নতুন জীবন! তুমি ওয়ালিদের সন্তান এ কথা ঠিক, কিন্তু সে তো মরে গেছে। এখন তুমি সোলায়মানের বাবা! সে জীবিত আছে। তার জন্য সুন্দর এক পৃথিবী গড়ার দায়িত্ব তোমার। যে পৃথিবী হবে হানাহানিমুক্ত, ভালোবাসায় সিক্ত, মানবতার জয়গানে মুখর। তাঁর চেতনায় বারবার আঘাত হানছে দুটো নাম। একদিকে রয়েছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, যিনি একটি নতুন দ্বীন প্রচার করছেন। অন্যদিকে ওয়ালিদ— তাঁর পিতা, যিনি এই দ্বীনের ঘোর শত্রু ছিলেন। পিতা এই শত্রুতা উত্তরাধিকারসূত্রে তাকে দিয়ে গেছেন। তিনি এখন দুনিয়ায় নেই, কিন্তু তার শত্রুতার উত্তরাধিকার বহন করছেন তার সন্তান খালিদ বিন ওয়ালিদ।

খালিদের ঘোড়া আপন গতিতে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে যাচ্ছে পানির এক উৎসের দিকে। খালিদ সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন। খেজুরের সতেজ বৃক্ষরাজি শোভিত মনোরম এক মরুদ্যান। অশ্ব সেদিকেই ছুটে চলেছে।

বাগানে প্রবেশ করে খালিদ অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামলেন। পাগড়ি খুলে ঝরনার পাশে দাঁড়িয়ে দুই পা একত্রিত করে ঝুঁকে পড়লেন। অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে মুখে-মাথায় ছিটালেন। দেখলেন, তাঁর ঘোড়াটিও পানি পান করছে। খালিদ ঝরনার অন্য পাশে চলে গেলেন। প্রাণভরে পান করলেন সুপেয় পানি। তারপর ফিরে এলেন ঘোড়ার কাছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামিয়ে জিনের সাথে বাঁধা মোটা কাপড়ের বিছানা খুলে গাছের ছায়ায় বিছিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লেন তিনি।

পথশ্রমে ভীষণ ক্লান্ত খালিদ। শুয়ে শুয়ে ভাবলেন, একটু ঘুমিয়ে নেবেন। কিন্তু মনের ভেতর স্মৃতির হাজারো কাফেলা এমন ছোট্টাছুটি শুরু করল যে, কিছুতেই আর ঘুমাতে পারলেন না। সাত বছর আগের একটি দিনের কথা স্মরণ হলো তাঁর। সেদিন অত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই একজোট হয়ে মুহাম্মাদ (সা.)-কে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। সে পরিকল্পনায় খালিদের বাবা ওয়ালিদ ছিলেন সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ও অগ্রগামী।

৬২২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের এক রাত! কুরাইশ সম্প্রদায়ের লোকেরা রাসূলে আকরাম (সা.)-কে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করার জন্য মেতে উঠল। তারা এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার জন্য এমন সব লোক বাছাই করল, যারা আসলে মানুষরূপী পশু। বর্বর ও জংলি। খালিদ বিন ওয়ালিদ কুরাইশ বংশের শ্রেষ্ঠ গোত্রের বলিষ্ঠ নওজোয়ান। বয়স সাতাশ বছর। রাসূল (সা.)-কে হত্যার জন্য সংগঠিত ঘাতকদলের সদস্য থাকাটাই তাঁর জন্য স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তিনি ঘাতক দলের অন্তর্ভুক্ত হলেন না। সাত বছর আগেকার রাত, অথচ মনে হচ্ছে সেদিনের ঘটনা। সেদিন কী এক দ্বিধা এসে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাকে। এ হত্যা-পরিকল্পনার ব্যাপারে একবার মনে হচ্ছিল তিনি সন্তুষ্ট, আবার পরক্ষণেই উৎকট অসন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠছিল তাঁর চেহারায়ে।

যখন মনে হতো মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর আপন সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্ম—যে ধর্ম যুগ যুগ ধরে তার বাপ-দাদারা পালন করে আসছে—সেই পৌত্তলিক ধর্মকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন এবং নিজেকে আল্লাহর রাসূল বলে দাবি করেছেন, তখন মনে হতো—তাঁকে হত্যা করাই উচিত। এ কথা মনে হলেই তাঁর চেহারায়ে ফুটে উঠত সন্তুষ্টির ভাব।

কিন্তু যখন রাতের অন্ধকারে গোপনে হত্যা করার পরিকল্পনা গৃহীত হলো, তখন বিদ্রোহ করে উঠল তাঁর মন। এ কেমন বর্বরতা! কোনো রকম আত্মরক্ষার সুযোগ না দিয়ে শত্রু নিধনের এ কেমন কাপুরোষোচিত পদ্ধতি! একজন মাত্র লোককে হত্যা করার জন্য বিশাল বাহিনী গড়ে তোলার এ কেমন অসম চেপ্টা! তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ এখানেই। সে উত্তেজিত শত্রুকে সম্মুখ লড়াইয়ে নির্দিধায় হত্যা করতে পারে, কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় শত্রু নিধনের কথা চিন্তা করতেও বিবেকে বাধছে তার। এই দোটানায় পড়ে এ ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা যেমন তিনি করেননি, তেমনি তাদের সঙ্গে शामिल হওয়ারও কোনো আগ্রহ জাগেনি তাঁর মধ্যে।

নির্দিষ্ট রাতে যখন খুনিরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে হত্যা করতে গেল, তখন নবিজির ঘর ছিল ফাঁকা। সেখানে নবিজি তো ছিলেনই না; এমনকী ঘরে নবিজির আসবাবপত্রও ছিল না। নবিজির উঠান,

আস্তাবল সব ছিল শূন্য।

সে রাতে ষড়যন্ত্রকারী কুরাইশরা এই আশা বুকে নিয়ে ঘুমিয়েছিল যে, সকালবেলা তারা শুনতে পারবে- তাদের ধর্মকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী আর নেই, নিহত হয়েছে সে। কিন্তু সকালবেলা তারা যখন শুনল মুহাম্মাদকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, তখন নিরাশায় ছেয়ে গেল তাদের মন। তারা একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল আর কানে কানে জিজ্ঞেস করছিল- ‘এই, এটা কী হলো? মুহাম্মাদ কোথায় গেল?’

আল্লাহর মহিমায় রাসূলে আকরাম (সা.) তাঁকে হত্যা করার এই ষড়যন্ত্রের খবর আগেই পেয়েছিলেন। তাই রাতে হত্যাকারীরা তাঁর বাড়িতে চড়াও হওয়ার অনেক আগেই তিনি বিশ্বস্ত সঙ্গী আবু বকরকে নিয়ে মক্কা থেকে মদিনার পথে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তখন মদিনার নাম ছিল ইয়াসরিব। সকাল হওয়ার আগেই তিনি ওদের নাগালের বাইরে বহু দূরে চলে গিয়েছিলেন।

সে ঘটনার পর পেরিয়ে গেছে সাতটি বছর। আজ সাত বছর পর একইভাবে মদিনার পথ ধরেছেন খালিদ বিন ওয়ালিদ। নিঃসঙ্গ, নির্বাক। চলার পথে সারাক্ষণ একটি নাম অন্তরে ধারণ করে আছেন, সে নাম- মুহাম্মাদ (সা.)।

উহুদ যুদ্ধের কথা মনে পড়ছে তাঁর। দেবতা হোবল ও উজ্জার শত্রু মুহাম্মাদকে হত্যার জন্য কী প্রাণপণ চেষ্টাটাই না করেছিলেন সেদিন! আল্লাহর অশেষ রহমত, আহত হলেও সেদিন মারা যাননি তিনি। সেদিন যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেত, তাহলে কোথায় পেতেন তিনি এমন মহামানব! যার জন্য তাঁর অন্তরে সৃষ্টি হয়েছে একশো একটি সমুদ্রের ভালোবাসা। খালিদের মনে কত কথা, কত স্মৃতিই না এখন তোলপাড় করছে! সেই স্মৃতির পাতা উলটাতে উলটাতে কেটে গেছে ষোলোটি বছর। মনে পড়ছে ৬১৩ খ্রিষ্টাব্দের এক সন্ধ্যা। রাসূলে করিম (সা.) কুরাইশদের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দাওয়াত করেছেন তাঁর বাড়িতে। খাওয়া-দাওয়ার পর রাসূলে করিম (সা.) মেহমানদের উদ্দেশ্য করে বললেন-

‘হে বনি আবদুল মুত্তালিব! তোমাদের সামনে এখন আমি যে উপটোকন ও উপহার পেশ করব, তা আরবের কোনো ব্যক্তিই তোমাদের সামনে পেশ করতে পারবে না। এ মহা উপহার-সামগ্রী তোমাদের সামনে হাজির করার জন্য আল্লাহ আমাকেই মনোনীত করেছেন। আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন তোমাদের এমন এক পথের দিকে ডাকি, যে পথ তোমাদের দুনিয়ার জীবনে পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও আনন্দ দেবে এবং সেইসঙ্গে দুনিয়া থেকে যেদিন চলে যাবে, সেদিন তোমাদের পরকালীন জীবনের সাফল্যও নিশ্চিত করবে।’

এমনিভাবে রাসূলে আকরাম (সা.) ওহির প্রথম তিন বছর তাঁর নিকটাত্মীয় ও বন্ধুদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। খালিদ সেদিনের সেই মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন না, তবে তাঁর পিতা ওয়ালিদ ছিলেন নিমন্ত্রিতদের মধ্যে। মাহফিল থেকে ফিরে এসে পুত্র খালিদকে উপহাস করে বলেছিলেন- ‘শুনেছ খালিদ, আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র মুহাম্মাদ বলে কিনা সে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ, নবি!’

‘আমি জানি, আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদের নামকরা সরদার ছিলেন।’ ওয়ালিদ পুত্রকে আরও বলছিলেন— ‘নিঃসন্দেহে মুহাম্মদের বংশ খুবই মর্যাদাবান, কিন্তু তাই বলে তাঁর বংশের কোনো ব্যক্তি কেমন করে নবুয়তের দাবি করতে পারে? আল্লাহর কসম! হুবল ও উজ্জার কসম! আমার বংশ মর্যাদা কারও চেয়ে কম নয়। নবুয়তের দাবি করলেই কি কেউ আমাদের চেয়ে বেশি মর্যাদাবান হয়ে যাবে?’

‘আপনি তাকে কী বলে এসেছেন?’ পিতার কথা শুনে প্রশ্ন করেছিল খালিদ।

‘এ কথা শুনে প্রথমে আমি তো “থ” বনে গেলাম। পরে আমরা সকলেই হেসে উঠলাম।’ ওয়ালিদ বললেন। ‘কিন্তু মুহাম্মদের চাচাতো ভাই আলি মুহাম্মদের নবুয়ত মেনে নিয়েছে।’ খালিদ তাঁর পিতার ব্যঙ্গমাখা হাসির কথা আজও ভোলেনি।

৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের একটি দিন। মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়ার রাস্তার পাশে এক খেজুর বাগানে শুয়ে খালিদের মনে পড়ল সে দিনটির কথা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়তের দাবি কুরাইশপ্রধানগণ মেনে নিতে পারছিল না। অন্যদিকে, নির্যাতিত অসহায় সাধারণ মানুষ তাঁর নবি হওয়ার দাবি মেনে নিয়ে অনেকেই তাঁর অনুসারী হয়ে যাচ্ছিল। এদের বেশিরভাগই ছিল যুবক। যদিও নিঃস্ব ও গরিবরাই ইসলাম কবুল করছিল, তবু এতেও নবি করিম (সা.)-এর উদ্দীপনা ও শক্তি বাড়ছিল। আশান্বিত হয়ে তিনি প্রচারকাজ আরও বাড়িয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী। মুসলমানরা আশায় দিন গুনছিল, কবে তারা কাবাঘরে রক্ষিত ৩৬০টি মূর্তি সেখান থেকে অপসারণ করতে পারবে।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও আরবের লোকেরা সবাই এক আল্লাহকে মানতো, কিন্তু পূজা করত মূর্তিগুলোর। তারা সেগুলোকে দেবতা ও দেবী বলত এবং আল্লাহর পুত্র ও কন্যা বলে গণ্য করত। কুরাইশরা যখন দেখল, তারা মুহাম্মদের যে দ্বীনের উপহাস করছে, সেই দ্বীনই সবার কাছে সমাদৃত হচ্ছে, তখন তারা তাঁর প্রচারকাজে বাধা দেওয়া শুরু করল। কিন্তু এতেও মুহাম্মাদ (সা.) বিরত না হওয়ায় তারা দলবদ্ধভাবে তাঁর মোকাবিলা করতে চাইল। তারা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার-উৎপীড়ন শুরু করল এবং তাদের বেঁচে থাকার পথে বাধার দেয়াল খাঁড়া করে দিতে লাগল।

খালিদ অবাক হয়ে দেখত, মুহাম্মাদ মক্কার অলি-গলি, রাস্তা ও বাজারের যেখানেই লোকজনকে দেখতে পেত, সেখানেই ছুটে যেত এবং তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিত। মুহাম্মাদ প্রচণ্ড আবেগ ও আকুতি নিয়ে লোকজনকে বলত— ‘এই মূর্তি তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না। কারণ, মানুষের উপকার বা ক্ষতি করার কোনো শক্তি এদের নেই। তোমরা মূর্তিপূজা ছেড়ে দাও। ইবাদত করো একমাত্র আল্লাহর, যিনি সর্বশক্তিমান, যার কোনো শরিক নেই।’

রাসূলুল্লাহর বিরোধিতায় কুরাইশদের যে চারজন নেতা বেশি তৎপর ছিলেন, তারা হলো— খালিদের বাবা ওয়ালিদ, রাসূলের আপন চাচা আবু লাহাব, ধনকুবের আবু সুফিয়ান ও খালিদের চাচাতো ভাই আবুল হাকাম। মুসলমানদের ওপর এরা অকথ্য জুলুম, অত্যাচার শুরু করেছিল।

কুরাইশদের এ চার শীর্ষ নেতা মূর্খতা ও বর্বরতার শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের হিংসা ও হিংস্রতা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। রাসূলের বিরোধিতায় তারা এমনসব কাজ করতে লাগল, যা কোনো সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক করতে পারে না।

সে সময় আরবে রক্তের বন্ধন ছিল খুব তীব্র। আপন গোত্রের লোক অন্যায় করলেও তারই পক্ষ নিত গোত্রের লোকেরা। সেই বন্ধন ছিন্ন করে আবু লাহাব আপন ভাতিজার সাথে অমানুষিক আচরণ করায় লোকজন আড়ালে- আবড়ালে তাকে আবু জেহেল অর্থাৎ মূর্খের বাবা বলে ডাকতে শুরু করল। অল্প দিনের মধ্যেই এ নাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। কিছুদিন পর অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, জনগণ তার আসল নামটাই ভুলে গেল। ইতিহাসও এই ছোটোখাটো শক্ত-পোক্ত লোকটিকে আবু জেহেল নামেই স্মরণ রেখেছে।

এইসব জাহেলদের কথা মনে হতেই অসহ্য যন্ত্রণায় বিষিয়ে উঠল তাঁর মন। পুরোনো সে দিনগুলোর কথা স্মরণ করে লজ্জিত হলো নিজে। কুরাইশের লোকেরা কতবার যে রাসূলের ঘরে দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনা ছুড়ে ফেলেছে! মনে পড়ছে— যেখানেই কোনো মুসলমান ইসলামের দাওয়াত দিতে গেছে, সেখানেই কুরাইশের লোকেরা গিয়ে হটগোল সৃষ্টি করেছে। চরিত্রহীন ও সৃষ্টিছাড়া বাউন্ডুলে লোকদের রাসূলের পেছনে লাগিয়ে দিয়ে তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

খালিদের তবু একটু প্রশান্তি ছিল, তাঁর পিতা মুহাম্মাদ (সা.)-এর বিরোধী হলেও এমন জঘন্যতম কাজে কখনো লিপ্ত হননি। তিনি কুরাইশের অন্য তিন শীর্ষ নেতার সঙ্গে মিলে একাধিকবার রাসূল (সা.)-এর চাচা আবু তালিবের সাথে দেখা করে তাঁর ভাতিজাকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে বলেছেন। তারা কিছুটা হুমকিও দিয়েছিলেন। বলেছিলেন— ‘যদি ভাতিজাকে মূর্তির বিরোধিতা করা ও নবুয়তের দাবি থেকে বিরত রাখতে না পারো, তবে দেখবে— কোনো এক দিন সে কারও হাতে খুন হয়ে গেছে!’ আবু তালিব অবশ্য দুই বারই ওদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পিতার বিরাট ত্যাগের কথা খালিদের স্মরণে এলো। আন্নার ছিল খালিদের সহোদর ভাই। দেখতে ছিল খুবই সুন্দর এবং অত্যন্ত মেধাবী। খালিদের বাবা ওয়ালিদ একদিন তাকে কুরাইশ সরদারের কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন— ‘তোমরা এই ছেলেটিকে মুহাম্মদের চাচা আবু তালিবের কাছে নিয়ে যাও আর বলো, একে রেখে যেন সে তার পরিবর্তে মুহাম্মাদকে আমাদের হাতে সঁপে দেয়।’

খালিদ তাঁর পিতার এমন কঠিন সিদ্ধান্তে কেঁপে উঠেছিল। পিতা যখন ভাইকে নিয়ে গেল, তখন খালিদ ভাইয়ের বিচ্ছেদে নির্জনে বসে অঝোরে কতই না কেঁদেছিল!

সরদাররা আন্নারকে রাসূল (সা.)-এর চাচার সামনে রেখে বলল— ‘হে আবু তালিব! এই সুন্দর ছেলেটাকে তুমি চেনো? এ আন্নার বিন ওয়ালিদ! তুমি এও জানো, তুমি যার সরদার, সেই বনু হাশিমের খান্দানে এমন সুশ্রী ও বুদ্ধিমান যুবক আজ অবধি জন্মেনি। এই যুবককে তোমার কাছে চিরদিনের জন্য সঁপে দিতে এসেছি। যদি একে তুমি তোমার সন্তান হিসেবে রাখো, তবে সে সারা জীবন তোমার অনুগত থাকবে। আর যদি তাকে গোলাম বানিয়ে রাখো, তবে আল্লাহর কসম করে

বলতে পারি! তোমার জন্য এই ছেলে আপন জীবনও উৎসর্গ করবে।’

আবু তালিব বললেন— ‘কিন্তু তোমরা এই সুন্দর যুবককে কেন আমার কাছে দিতে চাচ্ছ? তবে কি বনু মাখজুম গোত্রের মায়েরা আপন সন্তানকে শেষ পর্যন্ত নিলাম করা শুরু করেছে? বলো, তোমরা এর কত মূল্য দাবি করো।’

কুরাইশের একজন সরদার দাবি জানাল— ‘এর মূল্য কিছু না, এর বিনিময়ে শুধু তোমার আপন ভাতিজা মুহাম্মাদকে দিয়ে দাও!’ তোমার ভাতিজা তোমার লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কারণ হয়েছে। সে তোমার বাপ-দাদার ধর্মকে বাতিল করে নতুন ধর্ম তৈরি করেছে। তুমি কি দেখ না, সে আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি করেছে?’

‘তোমরা আমার ভাতিজাকে নিয়ে কী করবে?’

‘আমরা ওকে হত্যা করব।’

আরেক নেতা উত্তর দিলো— ‘আমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করলে তাতে বেইনসাফি হবে না। কারণ, আমরা তোমার ভাতিজার বিনিময়ে তোমাকে আমাদের সবচেয়ে সুন্দর ও বুদ্ধিমান যুবককে দান করছি।’

আবু তালিব বললেন— ‘কিন্তু এটা হবে মহা অন্যায় ও অবিচার! তোমরা আমার ভাতিজাকে হত্যা করবে, আর আমি তোমাদের সন্তানকে লালন-পালন করব, আদর-যত্ন করব, আমার সম্পদ থেকে এর জন্য ব্যয় করব, তোমরা আমার কাছে এ কেমন দাবি নিয়ে এসেছ? এ বিনিময় সম্ভব নয়, আমি তোমাদের সসম্মানে বিদায় জানাচ্ছি।’

খালিদ যখন দেখল সরদাররা তাঁর ভাইকে নিয়ে ফিরে এসেছে, আর তাদের কাছে শুনল আবু তালিব তাকে গ্রহণ করেননি, তখন খালিদের আনন্দ আর ধরে না।